মন্ত্রীর 'পিএস' পরিচয়ে আদম ব্যবসা!

প্রতারণার নানা কৌশলে চলছে আদম ব্যবসা। দূর প্রবাসের স্বপ্নে বিভোর আনোয়ারদের মতো সহজ-সরল অনেকেই পড়ছে এমন প্রতারকদের ফাঁদে। মন্ত্রীর 'পিএস' পরিচয়েও চলছে প্রতারণা... **সুমি খান**, চট্টগ্রাম থেকে

'আমি হয়তো ফেরত টাকা পাবো না। কিন্তু আর কোনো মা যেন এ রকম প্রতারিত না হয়, মেহনতের টাকা না হারায়- তাই আমি মুখ খুলছি।' কান্নাভেজা কণ্ঠে কথাগুলো বললেন মেমোনা খাতুন শামশাদ বেগম। চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়ির আখতার ভবনের বাসিন্দা এই মহিলা এখন বিশাল ঋণের বোঝা টানছেন। ছেলেকে আয়ারল্যান্ডে পাঠানোর জন্য নিজের সামান্য সঞ্চয় ভাঙিয়ে ও চড়া সুদে ঋণ নিয়ে মোট সাড়ে ১১ লাখ টাকা তুলে দিয়েছিলেন প্রতারক আদম ব্যবসায়ীর হাতে। ছেলে আনোয়ার অর্ধমৃত অবস্থায় মালদ্বীপ থেকে দেশে ফিরে এসেছে। বহু চেষ্টা-তদবির করে সাড়ে ছয় লাখ টাকা উদ্ধার করতে পেরেছেন মেমোনা। বাকিটা পাননি। হয়তো পাবেনও না। কারণ এই আদম ব্যবসায়ীটি একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর ছত্রছায়ায় আছে। সম্ভবত সে জন্যই সাধারণের কাছে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা সহজ হয়েছে। মানুষের বিশ্বাসের সুযোগে এভাবেই গড়ে উঠেছে শক্তিশালী আদম-পাচার সিন্ডিকেট, যাদের মাধ্যমে একের পর এক প্রতারিত হচ্ছে স্বপ্নচারী তরুণরা।

'মন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে বিমানে করে সোজা আয়ারল্যান্ড যাবে তোমার ছেলে।' মেমোনা খাতুনকে এভাবেই প্রলোভন দেখায় জহির। নিজেকে সে পরিচয় দেয় মন্ত্রীর 'পিএস' হিসেবে। তাকে সমর্থন দেয় আরো কয়েকজন। আয়ারল্যান্ডে গিয়ে লাখ লাখ টাকা কামাবে এমনও বলা হয়।

মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী হোটেল ব্যবসায়ী স্বামী কিডনি রোগী। তার চিকিৎসায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। পুত্র আনোয়ার 'ডাক্তার' হবে এমন আশা পূরণ হয়নি। ছেলের ২১ বছর হতে না হতেই বিয়ে দিয়েছেন প্রতিবেশী আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ আবু হানিফের কন্যার সঙ্গে। সব শুনে আবু হানিফও সমর্থন দিলেন জহিরকে তার ঘনিষ্ঠজন হিসেবে। তবে প্রয়োজন সাড়ে ১১ লাখ টাকা। এতো টাকা দিতে হবে কেন? জানতে চাইলে বলা হয়, দু'জন বড় মন্ত্রীকে টাকা দিতে হবে। দেড় লাখ টাকা প্লেন ভাড়া। তাই নগদ পাঁচ লাখ

প্রতারক জহিরের ভাই রুবেল আহমেদ নিজেও আদম পাচার চক্রে জড়িত

টাকা খামে ভরে টেবিলের নিচ দিয়ে মন্ত্রী সাহেবের হাতে দিলে উনি নিজের প্যাডে সাইন দেবেন। এছাড়া আরো ৫ লাখ টাকা মন্ত্রীর সচিবকে দিতে হবে, উনি সবার সাইন নিয়ে বিদেশে কাজের সমস্ত কাগজ ঠিক করে দেবেন।' মেমোনা সব শুনে আশায় বুক বাঁধলেন। মন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি আয়ারল্যান্ড যাবে তার ছেলে আনোয়ার। মন্ত্রীর 'পিএস' (!) তো মিথ্যা বলবে না। নিজের বেয়াই বলছে, এলাকার আশরাফ আলী, আলহাজ ফজল কবির আশ্বাস দিচ্ছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, মাসে ২৫ হাজার টাকা সুদে বিএনপির কমিশনার প্রার্থী সালাউদ্দিনসহ কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিলেন মেমোনা খাতুন।

২০০৪ সালের ৩০ অক্টোবর চুক্তিপত্রে সই হলো। কিন্তু কৌশলে এখানে কোথাও জহির স্বাক্ষর করলেন না। চুক্তিপত্রে দ্বিতীয় পক্ষ মানে টাকা গ্রহণকারী হলেন আশরাফ আলী ও রুবেল (জহিরের ছোট ভাই)। প্রথম পক্ষ হলেন মোছাম্মৎ মেমোনা খাতুন প্রকাশ শামশাদ বেগম, আখতার ভবন, কাজীর দেউড়ী। সাক্ষী ছিলেন জহিরের মামা আবদুল লতিফ, আবু হানিফ ও আলহাজ ফজল কবির। তবে চুক্তিপত্রে শুধু একজনের অস্পষ্ট স্বাক্ষর ছিল।

এই চুক্তিপত্রে প্রথম পক্ষের স্থায়ী ঠিকানা থাকলেও টাকা গ্রহীতা দ্বিতীয় পক্ষের স্থায়ী ঠিকানা দেয়া হয়নি। ১০০ এবং ৫০ টাকার ২টি স্ট্যাম্পে এই চুক্তিপত্র (স্ট্যাম্প নম্বর ঠ ৮৯৮৩২৬১ এবং ঢ ৬৪৬৫১০২)।

মন্ত্রীর অফিস দেখিয়ে প্রতারণা

চুক্তিপত্র করার আগে আনোয়ারকে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবে বলে ঢাকায় নিয়ে যায় জহির। বলা হয়, যেন ও নিজেই কথা বলে নেয়। মিন্টো রোডে মন্ত্রীর অফিসে ঢুকে সহজ-সরল যুবক আনোয়ার অপেক্ষায় থাকেন এক্ষুণি মন্ত্রী আসবেন ওর সঙ্গে হেসে কথা বলবেন, আয়ারল্যান্ডে নেবেন বিমানে করে। অফিসের দেয়ালে চারদিকে মন্ত্রীর ছবির পোস্টার। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নির্যাতনের পোস্টার। বিশ্বাস হয় আনোয়ারের। 'হ্যাঁ, মন্ত্রীর অফিসই তো!' কিন্তু মন্ত্রী এলেন না। বলা হলো, তিনি সংসদে। সাংসদ না হয়েও সংসদে? আনোয়ার স্বপ্নের ঘোরে; বিশ্বাস হারালো না। ফিরে এসে মাকে বললো, 'মন্ত্রীর অফিস দেখে এলাম।' ৫ লাখ টাকা সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে দেয়া হলো জহিরের হাতে। তারপর স্বাক্ষর হলো চুক্তিপত্রে। তখনই বাকি টাকা দেয়া হলো। কয়েক দিন পর ট্রেনে চড়ে ঢাকা। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ছেলেকে বিদায় দিতে এসে ধাক্কা খেলেন মেমোনা খাতুন। প্রশ্ন করলেন, 'মন্ত্রী সাহেব কোথায়?' জহিরের ভাই রুবেল পরিচয় করিয়ে দিলো 'জাক্কার আলী'র সঙ্গে। বলা হলো 'মন্ত্রী সাহেব ব্যস্ত। উনি তোমাকে মালদ্বীপ থেকে নিয়ে যাবেন। এখন জাক্কার আলীর সঙ্গে যাও।' মালদ্বীপ নেমেই আনোয়ার বুঝতে পারে কিছু একটা সমস্যা আছে।

'মোটা চালের ভাত খেয়ে ৬ দিন রোজা ছিলাম'

প্রবাসী পিতা-মাতার কল্যাণে সচ্ছল পরিবারের সন্তান আনোয়ার কখনো অভাব দেখেনি। মালদ্বীপ নেমেই দেখে চারদিকে শুধু পানি, কোথাও পায়ের চিহ্ন নেই। ৭ ফুট বাই ৮ ফুটের ছোট্ট দম বন্ধ করা একটা রুমে ঠাঁই হলো। হোটেলটা ভীষণ নোংরা। টয়লেট ছোট্ট। তখন রমজান মাস। মোটা চালের

প্রতারিত আনোয়ারের মা মেমোনা খাতুন

টাকা ফেরত চেয়ে হুমকি পেয়েছেন ইয়াসমিন

ভাত খেয়ে সারা দিন রোজা। মোটা মোটা চানা আর বিস্বাদ 'জুস' খেয়ে রোজা ভেঙে ইফতার! এভাবেই দিন কাটাতে গিয়ে পরিচয় হলো আরো চারজন বাংলাদেশী প্রতারিত তরুণের সঙ্গে। তারা জানালো, পিতৃপুরুষের ভিটে জহিরের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে প্রলোভনে দেশ ছেড়েছে। ফাইভ স্টার হোটেলে চাকরির আশ্বাসে প্রতারিত করেছে সবাইকে। 'ছয় মাস ধরে আমরা এখানে পড়ে আছি। পাসপোর্ট, টাকা-পয়সা সব জাক্কার আলীর কাছে। ছারপোকার কামড়ে সারা গা ফুলে গেছে। হোটেলে 'টোকেন' নিয়ে 'অখ্যাদ্য' সব খেতে হচ্ছে। চোখের পানিও শুকিয়ে গেছে ভাই, কাঁদতে পারি না। ১৫ দিনের ট্যুরিস্ট ভিসার মেয়াদ অনেক আগেই শেষ। জাক্কার আলী চাকরি দেবে বলে পাসপোর্ট নিয়ে গেছে। তুমি সময় থাকতে ফিরে যাও। আমরা এভাবেই মনে হয় মরে যাবো।' প্রতারিতদের একজন বলল আনোয়ারকে। সব শুনে আঁতকে ওঠে আনোয়ার। ছুটে যায় জাক্কারের খোঁজে। সঙ্গে প্রতারিত চার যুবক। জাক্কারকে হাতের কাছে পেয়ে গলা টিপে ধরে। সিদ্ধান্ত নেয় তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে! আনোয়ার তখন জাক্কারকে চার যুবকের হাত থেকে বাঁচায়। বলে, 'তুই ওদের ১০০ ডলার করে দিয়ে দে, বেঁচে যাবি।' জাক্কার বাধ্য হয় তাদের ডলার দিতে। এবার আনোয়ার খাতির জমায় জাক্কারের সঙ্গে। বলে, 'ভাই আমার মা তো মরে যাবে! তুমিও কোনো এক মায়ের ছেলে। সত্যি করে বলো, আমাকে কি আয়ারল্যান্ড নেবে?'

জাক্কার অকপটে স্বীকার করে, 'না ভাই, আমরা ১ লাখ ১০/২০ হাজার টাকায় মানুষকে বিদেশে নেবো বলে এখানে ফেলে রাখি। তোর সঙ্গেও 'চিটিংগিরি' করেছি।' কেঁদে ফেলে আনোয়ার। বলে, 'ভাই, তোমাকে তো ওরা পুলিশে তুলে দিচ্ছিলো- আমি বাঁচালাম। আমাকে কিছু ডলার দিয়ে ছেড়ে দাও- ফিরিয়ে দাও আমার মায়ের বুকে।' মেমোনা খাতুনকে মালদ্বীপ থেকে ফোন করে আনোয়ার। 'মা, চারদিকে পানি- কোথাও যাওয়ার পথ নেই।' মেমোনা খাতুন জাক্কার আলীর সঙ্গে কথা বলেন। সেই মাসে ৫০ হাজার টাকা শুধু টেলিফোন বিল দিয়েছেন। জাক্কার আলী বলে, 'জহির আমাকে শুধু ৬০ হাজার টাকা দিয়েছে, এটাই আমার লাভ।' আনোয়ার বলে, 'এটাই আমাকে দাও, আমি তোমাকে আবার এ টাকা ফেরত পাঠাবো। জাক্কার অবশ্য মেমোনা খাতুনকে টেলিফোনে বলে, 'আজকে তোমার ছেলে না থাকলে আমি মরে যেতাম। ওকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।' এক সপ্তাহের ব্যবধানে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ছেলেকে দেখে চিনতে পারেন না মা মেমোনা খাতুন। ২৪ বছরের টগবগে তরুণ আনোয়ার রোদে পুড়ে, অনাহার-অর্ধাহারে ৬ দিনে শীর্ণ শরীর নিয়ে ফিরে এসেছে মায়ের বুকে। 'মা' ডাক শুনে জড়িয়ে ধরেন মেমোনা খাতুন। ক্ষুব্ধ বেদনার্ত স্বরে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সেদিন চারদিকে সাংবাদিক খুঁজেছি- পাইলেই বলতাম এই ঘটনা।'

ছেলের শীর্ণ শরীর নিয়ে সেদিন ঢাকায় থেকে গেলেন মেমোনা। বললেন, 'আজকে তুই ভালো করে খাওয়া-দাওয়া কর। ভালো হোটেলে রাত কাটাই- আমরা কাল চট্টগ্রাম ফিরবো। এক রাত বিশ্রাম নিয়ে গাড়িতে উঠবো।'

প্রতারকদের খোঁজে

পরদিন চট্টগ্রাম ফিরে সিদ্ধান্ত নিলেন ছেড়ে দেয়া যাবে না কাউকেই। যাদের নাম বলেছে জহির, সবার কাছে যেতে হবে। যেভাবেই হোক প্রতারকদের ধরতেই হবে!

ওদিকে আনোয়ার যখন মালদ্বীপে তখন রুবেল অগ্রণী ব্যাংকে মেমোনা খাতুনের অ্যাকাউন্ট খোলার ফরমে স্বাক্ষর নেয়। তবে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়নি, আরো স্বাক্ষর প্রয়োজন। মেমোনা খাতুন ফোন করলেন রুবেলকে। 'সাইন লাগবে বলেছিলে না? নিয়ে যাও।' রুবেল ছুটে আসে মেমোনার স্বাক্ষর নিতে। ঘরে ঢুকেই আনোয়ারকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়! কী করে ফিরে এলো এই ছেলে? তাড়াতাড়ি সে ফোন করে জহিরকে, বলে 'তাড়াতাড়ি টাকা কিছু দিয়ে মুখ বন্ধ কর।' দু'জনে শলাপরামর্শ করে দায়ী করলো জাক্কারকে। রুবেল বললো, 'তোমরা জাক্কারের বৌকে পুলিশে ধরিয়ে দাও, জাক্কার ধরা পড়বে।'

প্রতারিত ক্ষুব্ধ মেমোনা বলেন, 'আমি জাক্কারকে চিনি না। তোমরা টাকা নিয়েছো, বিদেশে নাওনি- ফেরত দাও টাকা।' নানা চেষ্টা-তদবিরের পর আবার সংশ্লিষ্টদের আসতে বাধ্য করা হলো। ১১ নবেম্বর, ২০০৪ আবার চুক্তিপত্র হলো। ১০০ (ঠ ৮০৯৮৪১৩) এবং ৫০ টাকার (ঢ ৭০৬২৪৯৭) স্ট্যাম্পে। এবার সাক্ষী ৪ জন। আব্দুল লতিফ (জহির-রুবেলের মামা), আবু হানিফ, আলহাজ্ব ফজল কবির ও আরেকজন যার স্বাক্ষর অস্পষ্ট। এই স্ট্যাম্প ২টি ৮-১১-০৪ তারিখে ২য় পক্ষ হিসেবে মোঃ রুবেল (পিতা নূরুল আবছার) স্বাক্ষরিত। চুক্তি স্বাক্ষরকালেই নগদ ৮৭ হাজার টাকা ফেরত দিল রুবেল।

এরপর নানা টালবাহানা করে সব মিলিয়ে ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেরত দেয় জহির ড্রাইভার। রয়ে যায় বাকি ৫ লাখ টাকা। বলা হয়, 'এই ৫ লাখ টাকা মন্ত্রী সাহেবের কাছে।' দৌড়াদৌড়ি করে মেমোনা খাতুন শরণাপন্ন হলেন অ্যাডভোকেট মকবুল কাদের চৌধুরীর। সব শুনে ও কাগজপত্র দেখে তিনি মন্ত্রীর একজন ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে বসার ব্যবস্থা করেন।

এদিকে সাক্ষী হিসেবে আব্দুল লতিফ, মোঃ আবু হানিফ ও আলহাজ্ব ফজল কবিরের ৭ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র হাজির করে রুবেল। এতে দ্বিতীয় পক্ষ রুবেল লেখা হলেও প্রথম পক্ষ কাটাকাটি করে 'সেমসাদ' স্বাক্ষর করা ছিল ১০০ ও ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে। এতে বলা হয় যে, দু'পক্ষের সিদ্ধান্তে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ১১ লাখ ৫০ হাজার টাকার স্থলে ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রথম পক্ষকে কিস্তিভিত্তিতে ফেরত দেবে। আগের চুক্তিপত্রগুলো হাতে লেখা হলেও এটা ছিল বেশ গোছালো এবং কম্পিউটার কম্পোজ করা।

চুক্তিপত্রটি দেখানো হয় মেমোনা খাতুনকে। মেমোনা ওটিকে জাল অভিহিত করে বলেন, 'আঁই মেমোনা খাতুন লিখি-আইরা কাটাকাটি লেখা আর ন।' কিন্তু অন্যরা তা মানতে অস্বীকার করেন। মেমোনা ২০০০কে জানান, 'এক পর্যায়ে মকবুল কাদের আমাকে আর আনোয়ারকে বলেন, তোমরা এখানে বিচার পাবে না- চলে যাও।' মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজন মেমোনাকে বলেন, 'আদম ব্যাপারীর কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায় না।

চুক্তিপত্র করার আগে আনোয়ারকে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবে বলে ঢাকায় নিয়ে যায় জহির। বলা হয়, যেন ও নিজেই কথা বলে নেয়। মিন্টো রোডে মন্ত্রীর অফিসে ঢুকে সহজ-সরল যুবক আনোয়ার অপেক্ষায় থাকেন এক্ষুণি মন্ত্রী আসবেন ওর সঙ্গে হেসে কথা বলবেন, আয়ারল্যান্ডে নেবেন বিমানে করে...

পোয়া পাইও বহুত হইয়ে যাতে মানুষের পোয়া মরি যায়।' মেমোনা তখন কেঁদে বলেন, 'আমার স্বামী কিডনি রোগী। টাকার বেশি প্রয়োজন। মন্ত্রী সাহেবদের নাম না বললে এই টাকা আমি এতো চড়া সুদে ধার করতাম না।'। এরপর পাড়ার বিএনপি নেত্রী টগরীকে নিয়ে টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করেন মেমোনা। ৫ লাখ টাকার জায়গায় তিনি তখন সাড়ে তিন লাখ টাকা নিতেও রাজি। মাসে ২৫ হাজার টাকা সুদ দিতে পারবেন না তিনি। এমনকি মন্ত্রীর বোন পর্যন্ত মেমোনার টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন। লাভ হয়নি।

মেমোনা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ছাত্রলীগের ছেলেরা কিডন্যাপ করতো, চাঁদা নিতো। আর বিএনপির লোকেরা বিদেশে পাঠানোর নামে ধোঁকা দেয়। অথচ আমরা পুরো পরিবার বিএনপি।' মেমোনা আরো জানান, পত্রিকা-টিভিতে সবকিছু জানিয়ে দেবেন বলার পর কথিত লোহা সাত্তারের ছেলে সিটিভির ফজল হুমকি দিয়েছে যে তার ছেলে বোমায় একা মরে পড়ে থাকবে। নিজের প্রাপ্য টাকা তো পাচ্ছেনই না বরং এখন রয়েছেন হুমকির মুখে। অসহায় মা মেমোনা খাতুন তবু আশাবাদী যে তারেক জিয়া বা খালেদা জিয়ার কাছে সব বলতে পারলে হয়তো ফিরে পাবেন তার পাওনা ৫ লাখ টাকা।

প্রতারকচক্রের ভাষ্য

গত ৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় জহির সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে আলাপের এক পর্যায়ে স্বীকার করেন যে, আয়ারল্যান্ডে কয়েকজনকে নেয়ার কথা ছিল। 'ঠিক আমি না, আমার ভাই রুবেল নিয়েছিলো, এখন অবশ্য বন্ধ করে দিয়েছে,' বললেন জহির। মেমোনা খাতুনের ছেলের ঘটনায় নিজের সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করে তিনি বলেন, 'এখন বাপ ছেলেকে চিনে না। রুবেল অপরাধ করেছে। ও প্রয়োজনে জেলে যাবে। আমি ঐ রেফারেন্স টানতে যাবো কেন?' তিনি নিজেকে মন্ত্রীর পিএস পরিচয়ে মেমোনা খাতুনের কাছে যাওয়ার অভিযোগ এড়িয়ে যান। বলেন, মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করলে ওরা মন্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারতো, এখন কেন অভিযোগ করছে? মেমোনার কাছ থেকে টাকা পেয়েই ১৪ লাখ দিয়ে কাজীর দেউড়ীতে আধাপাকা বাড়িসহ জায়গা কেনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কাজীর দেউড়ীর মানুষ থেকে নিয়ে জায়গা কেনা কি সম্ভব? আশরাফ আলী আর রুবেল একসঙ্গে এসব কাজ করেছে, ওরা জানে।'

একই দিন রাত ৯টায় রুবেল কাগজপত্র নিয়ে আসে সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিবেদকের কাছে। সঙ্গে আবু হানিফ এবং ফজল কবিরকে। ফজল কবির বললেন, 'আদম ব্যাপারীর থেকে পয়সা পওয়া যায় না জানি। তবুও মেমোনা খাতুনের বেয়াই আবু হানিফের সঙ্গে কথা বলে টাকার ব্যবস্থা করি। এই মহিলা এতো বাজে, তবুও বাড়াবাড়ি করছে।'

কাজীর দেউড়ী আল জামেয়য়াতুল ইসলামিয়ার মোতোয়াল্লি আবু হানিফ বললেন, 'আমার বেয়াইনের সঙ্গে রুবেল আর আশরাফের বিদেশ পারপাসে টাকা লেনদেন হয়। সাড়ে ১১ লাখ টাকার মধ্যে সাড়ে ৬ লাখ টাকা তো ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন আপনার কাছে কেন গেল বুঝলাম না।

রুবেল বললেন, 'আমার ভাই মন্ত্রীর পিএস তো, তাই বিদেশে লোক পাঠাতে পারে।' আবু হানিফ ও সজল কবির সংশোধন করে বললেন যে 'পিএসের মতো থাকে।' ড্রাইভারের অন্য অর্থ পিএস, যা এরা এতোদিন ব্যবহার করেছে সেটা প্রমাণ হয়ে যায়। রুবেল কথা বলতে থাকে জাল সইয়ের দলিল হাতে। ছবি তুলতেই সে খানিকটা ক্ষিপ্ত হয়। এর মধ্যে আবু হানিফ সটকে পড়েন। রুবেল আরো জানায় যে আশরাফ আলী এ কাজ করেছে, জাক্কার আলীর মাধ্যমে পাঠিয়েছে। আনোয়ারকে বিদেশ নেয়া প্রসঙ্গে প্রথমে বলে ওঠে, 'বিদেশে তো গেছে।' ফজল কবির বলে, মালদ্বীপ গেছে আর কি। মালদ্বীপ কেন নেয়া হলো এবং আনোয়ার কিভাবে ফিরলো এই প্রশ্নে তারা কিছুই জানেন না বললেন। রুবেল আরো বললেন, 'আমার ভাইয়ের শালাসম্বন্ধীও কয়েকজন এখনো মালদ্বীপে পড়ে আছে। ওদের কথা মতো পাঠিয়েছিলাম। জাক্কারের কারণে এদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে।'

এক পর্যায়ে রুবেলও দ্রুত চলে যায়। ফজল কবির অবশ্য দাবি করেন যে, মেমোনা খাতুনের প্রতি তার দয়ার কারণে সাড়ে ৬ লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছে। সে আর আবু হানিফ না হলে এই মহিলা ১ টাকাও পেতো না। তিনি মেমোনাকে নারী ব্যবসায়ী, কাজের মেয়ে ও বাজে মহিলা বলে অভিহিত করেন। আনোয়ারকে বোমা মেরে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিলেন কেন জানতে চাইলে জিভ কেটে বলেন, 'আমি দুইবার হজ করছি আপা। (মিনারেল ওয়াটারের বোতল ধরে) এটা জমজম কূপের পানি। এটা ধরে বলছি, আমি এইসব বলি নাই। ভালো কাজ করলে এরকম হবে জানি না।'

প্রতারিত ইয়াসমিন

এই চক্রের প্রতারণায় পড়ে মেমোনার মতোই এখন টাকার জন্যে কেঁদে মরছেন ইয়াসমিন, যাকে ঈদের আগের দিন রাতে অস্ত্র দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে রুবেল। ইয়াসমিনের ভাই এজন্য কোতোয়ালি থানায় জিডিও করেন। ৫০ হাজার টাকা নিয়েছিল রুবেলের মামা আবদুল লতিফ। চুক্তি হয়েছিল ১০% সুদে কয়েক মাসের মধ্যে তা ফেরত দেবে। টাকার খোঁজে ২ বার লতিফের শ্বশুরবাড়ি বোয়ালখালী নিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসে ইয়াসমিন। সে সাপ্তাহিক ২০০০কে জানায়, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি জহির তাকে বলেছে যে, 'আনোয়ারের টাকা ফেরত দিতে গিয়ে একটু চাপে আছি, ঈদের পরে তোমার টাকা দেবো।'

বিচার কি হবে

মেমোনা খাতুন ও ইয়াসমিন অসংখ্য প্রতারিতের মধ্যে দু'জন মাত্র। দু'জনেই সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা যাকাত চাইতে যাইনি। ভিক্ষা চাইতে যাইনি। মন্ত্রীর প্রশ্রয়ে তারা একের পর এক প্রতারণা করে যাচ্ছে- আমাদের পাওনা টাকা ফেরত চাই। এ প্রতারণার অবসান চাই।'

মেমোনা খাতুন বলেন, 'জহির আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছে, তোর ছেলে আসার আগে বললি না কেন আমাকে? আমি বলেছি, 'কেন, বললে আমার ছেলেকে পানিতে ফেলে দেয়ার অর্ডার দিতে? অনেকে বলছে, মহিউদ্দিনের কাছে গেলে আমি বিচার পাবো- যাই নাই। আমি ন্যায়বিচার চাই।'

এই প্রতারণার তথ্য যাচাই এবং ছবি নিতে গিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদককে অনেক প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং বিএনপি সব দলেরই কয়েকজন এই চক্রের সঙ্গে জড়িত।

মৃত্যু-হুমকি এই মেমোনা খাতুনের পরিবারকে তাড়িয়ে ফিরছে প্রতি মুহূর্তে। রুবেলের দেয়া হুমকির কারণে দু'দিন শয্যাশায়ী ছিলেন ইয়াসমিন। ঈদের দিন চোখের জলে শয্যায় কাটিয়েছেন। তারা জানতে চান নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার নাগরিক অধিকার কি কখনো ফিরে পাবেন? প্রতারকের উপযুক্ত শাস্তি কি প্রাপ্য নয়? কখন ফিরে পাবেন তাদের মেহনতের টাকা?